ইউনিট ৮

খামার বাণিজ্যিকীকরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন

ভূমিকা

কৃষি হলো দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৫ শতাংশ। মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪০ ভাগ এখনো কৃষির ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য, পুষ্টি ও শিল্পের কাঁচমালের উৎসও কৃষি। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষিকে কেন্দ্র করেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ কারণে কৃষিতে বাণিজ্যকরণের গতি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। বাণিজ্যিকভিত্তিতে রেণু থেকে পোনা, পুকুরে মাছের চাষ, ডিম থেকে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করে দেশের অনেক যুবক গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন এবং পুকুরে মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে গ্রামের উদ্যোগী যুবকরা। কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে গ্রামীণ মহিলাদেরও। এ কথা ভেবেই বাংলাদেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল সমন্বিত খামার কোর্সটি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

কৃষির এ নতুন অভিযাত্রায় যুক্ত হচ্ছে দেশের শিক্ষিত, সাহসী ও উদ্যোগী যুবসমাজ। এ ইউনিটটি থেকে কৃষি বানিজ্যিকীকরণের বিষয়টি জানতে পারবেন। সেসাথে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারবেন। উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের কৌশল সম্পর্কেও জানতে পারবেন। তাহলে আসুন, আমরা এ ইউনিটি শেষ করে বিষয়গুলো জেনে নিই।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৮.১ : খামার বাণিজ্যিকীকরণ সংজ্ঞা ও ধরন
পাঠ - ৮.২ : উদ্যোক্তার সংজ্ঞা ও ধরন
পাঠ - ৮.৩ : কৃষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সমস্যা ও সম্ভাবনা
পাঠ - ৮.৪ : উদ্যোক্তা উন্নয়নের পথ ও নির্দেশনা
পাঠ - ৮.৫ : কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ
পাঠ - ৮.৬ : কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ

পাঠ-৮.১ খামার বাণিজ্যিকীকরণ ও ধরন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাণিজ্যিক খামারের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- জীবিকা কৃষি এবং বাণিজ্যিক কৃষির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- মিশ্র খামারের বর্ণনা দিতে পারবেন।

বাণিজ্যিক খামার (Commercial Farming):

খামার বাণিজ্যিকীকরণ

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষেরই কৃষি সম্পর্কে কমবেশি ধারণা রয়েছে। তবে কৃষিতে বাণিজ্যিকরণের ধারণাটি নতুন নতুন হলেও বর্তমানে এটি প্রসার ঘটছে। কেননা বাণিজ্যিক কৃষিতে কমসময়ে অধিক লাভবান হওয়া যায়। তবে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। সেটি হলো– কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশে ছোট খামারের ভূমিকাই বেশি। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন অপরিহার্য। তাই সরকার কৃষি নীতি প্রণয়ন করেছে। আর এই জাতীয় কৃষি নীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক কৃষির প্রচলন করা এবং তা অব্যাহত রাখা। এতে বেকার যুবকগণ চাকুরীমুখী না হয়ে কৃষিভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। যেহেতু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাই মুনাফা অর্জনের বিষয়টি এখানে মুখ্য।

তাই বাণিজ্যিক খামার বা কৃষি ব্যবসা (Agribusiness) হলো ফসল ফলানো বা গবাদি পশু-পাখি পালন এবং মৎস্য চাষ প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। অর্থাৎ উৎপাদিত ফসল বা গবাদি পশু-পাখি বাজারে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করার জন্যই এ ধরনের খামার পরিচালিত হয়। ধরুন, আপনি বাড়ির আঙ্গিনায় ২০টি টমেটো চাষ করলেন। উৎপাদিত টমেটো নিজে খেলেন, প্রতিবেশিকে দিলেন এবং উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রয় করলেন। এটাকে নিশ্চয়ই বাণিজ্যিক খামার বলবেন না। কারণ এখানে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার কোন উদ্দেশ্য আপনার নেই। আবার ধরুন, মি. রহমান ৫ বিঘা জমিতে শুধু টমেটো চাষ করল। উৎপাদিত টমেটো বাজারে বিক্রয় করে তিনি ৪০,০০০ টাকা লাভ করলেন। এটিকে বাণিজ্যিক খামার বলা হবে। কেননা এখানে লাভের উদ্দেশ্য রয়েছে। মনে রাখবেন এটি সম্পূর্ণভাবে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়ে যেমন লাভ হয় তেমনিভাবে ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। রহমান সাহেবের টমেটো খামারেও রোগ-বালাই, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত নানা ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং তিনি মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি ঝুঁকিও গ্রহণ করেছেন। যেহেতু টমেটো উৎপাদন দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বৈধ তাই তাঁর খামারটি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

কৃষি ব্যবসায় লাভজনক হওয়ায় বর্তমানে অনেক বড় বড় শিল্পোদোক্তা খামার ব্যবসায় এগিয়ে আসছেন। প্রযুক্তির ব্যবহার, ফসলের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং উন্নত সার ব্যবহার ইত্যাদির সমন্বয় ঘটিয়ে কৃষির উৎপাদন কয়েকগুন বাড়ানো হয়েছে। এতে নিশ্চিত হয়েছে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা। কৃষিপণ্য এখন শুধু যে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এমন নয়; শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এর জলবায়ু, এর মানুষ সবই কৃষি বান্ধব। তাই এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তরা সহজেই কৃষি খামার তৈরী করে দেশে বিদেশে কৃষি পণ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এবার আসুন, খামার বাণিজ্যিকীকরণের ধরণ নিয়ে আলোচনা করি–

উপরের উদাহরণে টমেটোর বাগানটি মূলত 'জীবিকা কৃষি' (subsitence agriculture) এবং রহমান সাহেবের টমেটো খেত হলো 'বানিজ্যিক কৃষি' (commercial agriculture)। এই দুইয়ের পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো:

জীবিকা কৃষি	বাণিজ্যিক কৃষি
১. উৎপাদক নিজে ভোগ করে এবং উদ্বৃত্ত বাজারে বিক্রয় করে।	১. উৎপাদিত কৃষি পণ্যের পুরোটাই বিক্রয় করে।
২. শ্রম ভিত্তিক (labor-intensive) অর্থাৎ সনাতন পদ্ধতিতে হাতে সম্পন্ন করা হয়।	২. মূলধন ও প্রযুক্তি নির্ভর
৩. ছোট জায়গার প্রয়োজন হয়।	৩. বড় জায়গার প্রয়োজন হয়।
৪. প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।	৪. আধুনিক সেচ ব্যবস্থা বা অন্য কোনো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃতির নির্ভরশীলতা কমানো হয়।
৫. সনাতন	৫. আধুনিক
৬. অভিজ্ঞতা নির্ভর	৬. বিজ্ঞানভিত্তিক

এছাড়াও রয়েছে কৃষি বদল খামার (shifting farming), নিবিড় খামার (intensive farming), বিস্তৃত খামার (extensive farming), বৃক্ষরোপণ খামার (plantation farming) এবং মিশ্র খামার (mixed farming)। তাহলে আসুন, এগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করি:

কৃষিবদল খামার (Shifting farming): এ ধরনের খামারে খামারী এক টুকরা জমি পরিষ্কার করে এবং প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্য উৎপাদন করে। পরে জমির উর্বরতা নষ্ট হলে সেটিকে বিশ্রাম দেয় এবং অন্য টুকরা জমিতে নতুন করে চাষ করে। এ ধরনের কৃষিতে খামারী শুধু নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই কৃষি খামার করে।

নিবিড় ও বিস্তৃত খামার (Internsive and extensive farming): নিবিড় খামারের আয়তন ছোট হয় যেখানে খামারী সনাতন পদ্ধতিতে শ্রম ও সার ব্যবহার করে ফসল ফলায়। একটি জমিতে বার বার ফসল ফলানো হয়। সাধারণত ধান ও গম ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ধরনের ফার্ম বেশি প্রয়োজ্য। অপর দিকে বিস্তৃত খামারের জন্য বড় আকারের জমি প্রয়োজন যেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রযুক্তি এবং যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বর্ধিত ফলনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের খামার পরিচালিত হয়।

বৃক্ষরোপণ এবং মিশ্র খামার (Plantation and mixed farming): বৃক্ষরোপণ খামারে একটি ফসল দীর্ঘ মেয়াদে ফলন পাওয়ার জন্য রোপণ করা হয়। যেমন- চা বাগান। সাধারণত আমদানির উদ্দেশ্যে এ ধরনের খামার তৈরী করা হয়। মিশ্র খামারে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে আয় পাওয়ার জন্য গবাদিপশু, মাছ ইত্যাদির চাষ করা হয়। এর সাথে অন্যান্য ফসলও উৎপাদন করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী একটি বাণিজ্যিক খামার পরিদর্শণ শেষে প্রতিবেদন দিবে।

সারাংশ

বাণিজ্যিক খামার বা কৃষি ব্যবসা (Agribusiness) হলো ফসল ফলানো বা গবাদি পশু-পাখি পালন এবং মৎস চাষ প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। অর্থাৎ উৎপাদিত ফসল বা গবাদি পশু-পাখি বাজারে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করার জন্যই এ ধরনের খামার পরিচালিত হয়। নিবিড় খামারের আয়তন ছোট হয় যেখানে খামারী সনাতন পদ্ধতিতে শ্রম ও সার ব্যবহার করে ফসল ফলায়। বর্ধিত ফলনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের খামার পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন্‌টি বৃক্ষরোপণ খামারের আওতাভুক্ত?

ক. ধান খ. পাট

গ. চা ঘ. গম

২। কোন্‌ খামারে বার বার চাষ করা হয়?

ক. নিবিড় খ. কৃষি বদল

গ. বিস্তৃত ঘ. বৃক্ষরোপন

৩। বাণিজ্যিক খামারের মূল উদ্দেশ্য কোন্‌টি

ক. জনসেবা খ. কর প্রদান

গ. মুনাফা অর্জন ঘ. কোনোটি নয়।

পাঠ-৮.২ উদ্যোক্তার সংজ্ঞা ও ধরন
Entrepreneur : Definition and Types

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উদ্যোক্তার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- উদ্যোক্তার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;

উদ্যোক্তা
Entrepreneur

ধরুন, আপনি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। এখানে প্রশ্ন হলো – কেন এটি করবেন? নিশ্চয়ই মুনাফা অর্জনের জন্য মনে রাখবেন মুনাফা না হওয়ার একটি ঝুঁকি রয়েছে। উদ্যোক্তা হিসেবে আপনাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। অর্থাৎ মুনাফার উদ্দেশ্য নিয়ে সেটি অর্জন না হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে কোন ব্যবসা বা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনাকারীকেই উদ্যোক্তা বলা হয়।

অর্থনীতিতে উদ্যোগের সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শাস্ত্রে উদ্যোক্তা বলতে একটি সত্ত্বা (entity) কে বোঝানো হয়েছে যার নতুন কোনো আবিষ্কার বা কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পণ্য বা সেবার উৎকর্ষ সাধন করলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় তা সন্ধান করে এবং সে অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে। কৃষিতে প্রতিনিয়ত কারিগরি উন্নয়ন হচ্ছে। আর এগুলোর ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কারিগরি উদ্ভাবনটিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার জন্য উদ্যোক্তা পুঁজি, বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য সম্পদের সংগঠন করে। উদ্যোক্তা কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে করে অর্থনীতিতে আর্থিকমূল্য (Economic Value) সংযোজন করে।

উদ্যোক্তার সংজ্ঞা জানা হলো। এবার আসুন এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করি।

উদ্যোক্তার প্রকারভেদ
(Types of Entreprenurs)

নিচে বিভিন্ন প্রকার শিল্পোদ্যোক্তার ধরণ বর্ণনা করা হলো:

১. জাতিগত (Ethnic)

বাংলাদেশে রয়েছে কয়েকটি উপজাতির বসবাস। তাঁদের কৃষি খামারের ধরণও ভিন্ন হয়। যেমন- চাকমারা জুম চাষ করে। খাসিয়ারা পান চাষ করে। সুতরাং এ ধরনের জাতিগত ভিত্তিতে কৃষি উদ্যোক্তা হতে পারে। যদি একজন খাসিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পানের বরজ গড়ে তুলে তাহলে সেটিকে আমরা এথনিক খামার হিসেবে গণ্য করতে পারি।

২. প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional)

ধরুন, আপনার কৃষি খামারটি ব্যবসার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অন্য একটি খামার স্থাপন করল। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি নিজেই একটি উদ্যোক্তা।

৩. নারীবাদী (Feminist):

উদ্যোগের মাধ্যমে যিনি নারীতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ধ্যান-ধারণার প্রয়োগ ঘটান তাঁকে নারীবাদী উদ্যোক্তা বলা হয়। এ কাজটি কেউ ‘নারীর জন্য, নারীর দ্বারা’ (for women, by women) এমন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করছেন, আবার এনজিও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করেছেন। যেভাবেই করুক না কেন, সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সমতা সৃষ্টির অভিপ্রায় নারীবাদী শিল্পোদ্যোক্তা মাঝে বিরাজ করে।

৪. সামাজিক উদ্যোক্তা (Social Entrepreneur):

সাধারণভাবে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা মালিকের মাঝে বিতরণ না করে তা যখন সমাজ উন্নয়ন বা কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয় তখন তাকে সামাজিক ব্যবসা বলে। অর্থাৎ ব্যবসাটির সমাজে একটি ইতিবাচক রিটার্ন বা আয় প্রদান

করতে সামর্থ্য রাখে। এটা অনেকটা স্বেচ্ছাশ্রমের মত। সামাজিক উদ্যোক্তা সমাজের যে চাহিদা এখনও পূরণ হয়নি সে জায়গায় কর্মকাণ্ড চালায়। যেমন– ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রোগ্রাম, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ইত্যাদি কাজ সামাজিক শিল্পোদ্যোগের আওতাভুক্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তা সম্পর্কে বলবেন।

সারাংশ

সাধারণভাবে যিনি ব্যবসা করার জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করেন ও সে অনুযায়ী উপকরণ সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেন এবং তা পরিচালনা করেন তাঁকে শিল্পোদ্যোক্তা বলে। একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মানব সম্পদের সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। সাধারণভাবে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা মালিকের মাঝে বিতরণ না করে তা যখন সমাজ উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হয় তখন তাকে সামাজিক ব্যবসা বলে। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যবসায় উদ্যোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে তাকে ভবিতব্য উদ্যোক্তা বলে। যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন অস্থায়ী ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হয় তখন তাকে প্রকল্প উদ্যাক্তা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উদ্যোক্তা নিচের কোনটি?

ক. আর্থিক মূল্য সংযোজন
খ. মুনাফার উদ্দেশ্য থাকেনা
গ. কারিগরী জ্ঞান ব্যবহার করে না
ঘ. সেবা মূলক কাজে ব্যয় করে না

পাঠ-৮.৩ কৃষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন
Entrepreneurship Development in Agriculture

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

গত কয়েক দশকে কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে এবং কৃষিপণ্যের ব্যাপক উৎপাদন বেড়েছে। এর পেছনে কৃষি বাণিজ্যিকরণের ভূমিকা রয়েছে। কৃষিভিত্তিক বাণিজ্যে সার, বীজ, সেচের মতো প্রত্যক্ষ বিষয়ছাড়াও উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও বিপণন অনেক শাখা-উপশাখা রয়েছে। কৃষিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এবং সামাজিকভাবে মর্যাদা দিয়ে মানুষের জীবনমানের উন্নতি সাধন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি যুব সমাজকে কৃষির দিকে আকৃষ্ট করতে পারলে বিপুল র্কমসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বাংলাদেশের জলবায়ু এবং বর্তমানের কৃষি নীতি কৃষিতে উদ্যোক্তা তৈরীর ক্ষেত্রে সহায়ক। তাই যুব সমাজকে কৃষি খামার স্থাপনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশে ছোট-মাঝারি ব্যবসা উদ্যোগ দৃশ্যমান রয়েছে যার অধিকাংশই মৎস্য শিল্প ও ডেয়রী-পোলট্রি খাতেই বেশি দেখা যায়। তাছাড়া ভার্মিকম্পোষ্ট, মাশরুম উৎপাদন, ফল ও শাকসবজি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি উপকরণ ব্যবসায় মাঝারি উদ্যোক্তা, স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন ইত্যাদি। বাংলাদেশের কৃষিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

খামার পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন ও সার্ভিস প্রদান ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি কৃষি উপকরণ খাত ও খামারজাত উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বাজারজাতকরণ পদ্ধতির সাথে যুক্ত করে বাণিজ্যিক কৃষি প্রবর্তনের সাথে কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব।

আমাদের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবক। প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ যুবক শ্রমবাজারে আসছে যার মধ্যে ১২ থেকে ১৩ লাখ যুবক কাজের সুযোগ পায়। প্রায় ৭ লাখের বেশি যুবশক্তি প্রতি বছর বেকার থেকে যায়।

উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণ স্কীম চালুকরণ এবং একটি পরিকল্পিত মডেল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে উদ্যোক্তা বিষয়ক আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও কেস স্টাডি অন্তরর্ভূক্তকরণ জরুরি। শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশীয় বাস্তবতার নিরীখে কারিকুলাম উন্নয়ন করার মানসিকতায় ঘাটতি রয়েছে। কৃষি ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কৃষি খামার উৎসাহিত করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তরুণদের কৃষিতে আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন থাইল্যান্ডের " ইয়াং স্মার্ট ফারমার" ভারতের দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার এর " এ্যাট্রাকটিং অ্যান্ড রিটেইনিং ইয়ুথ ইন এগ্রিকালচার"।

কৃষক এখন আর শুধু ফসল উৎপাদনকারী নয়, সে এখন কৃষি উদ্যোক্তা বটে- এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের কৃষিতে বিপ্লব আনতে পারে। বাণিজ্যিক কৃষির প্রবর্তনে নিচ্ছেন নতুন নতুন কর্মসুচী। এই জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ ও নিশ্চিত করতে হবে। বাজেটে কৃষি খাতকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। "আজকের গ্রামের তরুণ-যুবা হোক আগামীকালের কৃষি উদ্যোক্তা" - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা লিপিবদ্ধ করবে।

সারাংশ

কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ণ হয়েছে। তাই কৃষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন আবশ্যক। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ ও নিশ্চিত করতে হবে। বাজেটে কৃষি খাতকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উদ্যোক্তার উন্নয়নের নিচের ইয়াং স্মার্ট ফারমার কর্মসূচিটি কোন দেশের?

ক. বাংলাদেশ খ. থাইল্যান্ড

গ. ভারত ঘ. শ্রীলংকা

পাঠ-৮.৪ কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ ঋণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি ঋণ সম্পর্কে ধারনা করতে পারবেন;
- ক্ষুদ্র ঋণের উৎস সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সরকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এর মাধ্যমে সারাদেশে কৃষি ঋণ বিতরণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকেও কৃষি ঋণের আওতায় এনেছে। তবে এদের ঋণের পরিমান কম।

সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত কৃষিঋণের ৬০ শতাংশের বেশি বিতরণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে শাখা প্রতিষ্ঠা করছে। মৌসুমি শস্য উৎপাদন, কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়, হাঁস-মুরগি ও গরুর দুগ্ধখামার প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষকদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। ভূমিহীন ও প্রান্তিকচাষি এবং গ্রামের মহিলাদের ঋণ দেওয়ার জন্য কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের ১৭টি বিশেষ কর্মসূচির অর্থায়নে ১৯৯৯-২০০০ সালে জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ১২৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

অনেক দরিদ্র কৃষক জটিল নিয়ম-কানুন ও জামানত সমস্যার জন্য ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না। এজন্য এনজিওদের মাধ্যমে জামানতবিহীন কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে। যা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পরিচিত। এবার আসুন, এ ক্ষুদ্র ঋণের বিষয়ে জানি–

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্রদের মধ্যে জামানতহীন ঋণের যোগান দিতে একটি অপ্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুরু করে। ক্ষুদ্র ঋণের কার্যকর ব্যবহার এবং আদায় নিশ্চিত করার জন্য দলীয়ভাবে প্রদান ঋণগ্রহীতাকে নিজেদের উদ্যোগে গঠিত ৫ জনের একটি দল হিসেবে ব্যাংকে উপস্থিত হতে হয়। একজন সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সকল সদস্যের ঋণপ্রাপ্তি বাতিল বা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দলের সদস্যগণ নিজ নিজ ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করতে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংক নিজস্ব উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি করে। ফলে গ্রামীণ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় অধিক হারে সুদ আদায় করলেও ঋণখেলাপি সমস্যাকে দূর করে কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অধীনে গ্রাহকরা (অধিকাংশই মহিলা) হাঁস-মুরগি বা গাভী পালন, মৎসচাষ, শাকসবজি ও ফলের বাগান বা কুটির শিল্পের মতো ছোটখাটো কাজের মাধ্যমে ভাগ্য উন্নয়ন করছে। অন্যান্য এনজিও বা একই ধরনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক এবং আরও তিনটি প্রধান এনজিও ব্র্যাক, আশা ও প্রশিকা ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩৯১৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

ব্যাংক এবং এনজিওদের বাইরেও পেশাগত সমবায় সমিতিগুলি নিজেদের সঞ্চয় থেকে সদস্যদের ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। এসব সমবায় হচ্ছে সমবায় ভূমিবন্ধকী ব্যাংক, ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, জেলে সমবায় সমিতি, আখ উৎপাদক সমবায় সমিতি, কৃষি সমবায় সমিতি (ডিপার্টমেন্ট), কৃষি সমবায় সমিতি (বিআরডিবি), দুগ্ধ সমবায় সমিতি, ভূমিহীন কৃষক সমবায় সমিতি, খামার সমবায় সমিতি, তৈল উৎপাদক সমবায় সমিতি, পানচাষি সমবায় সমিতি ও চীনাবাদাম সমবায় সমিতি। এসব সমিতি কৃষি উন্নয়নের জন্য সদস্যদের ঋণ প্রদান করে।

এবার আসুন, আমরা প্রকল্পে কৃষি ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিই।

সমন্বিত মুরগি ও মাছ চাষ

উদ্যোক্তা হিসেবে মনে রাখবেন ঝুঁকি নিরসন বা কমানোর জন্য আপনাকে খামারটিকে বহুমুখী করা প্রয়োজন। যেমন- ধরুন, আপনি পুকুরে মাছ চাষ করছেন। সহজেই এখানে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদির জন্য খামারের পরিসর বাড়াতে পারবেন। যা সমন্বিত খামার নামে পরিচিত। তাই আসুন এ বিষয়ে জেনে নিই।

হাঁস ও মাছ চাষ করার জন্য যেভাবে পুকুর তৈরি করা হয় ঠিক সেইভাবে পুকুর প্রস্তুত করে সমন্বিত মুরগি ও মাছ চাষ করা যায়।

(১) সমন্বিত মুরগি ও মাছ চাষ

- এই পদ্ধতিতে পুকুরের উপর মুরগির ঘর তৈরি করা হয় বলে পৃথক জায়গার প্রয়োজন হয় না।
- মুরগির উচ্ছিষ্ট খাদ্য ও বিষ্ঠা মাছের খাদ্য ও পুকুরের জৈব সার হিসেবে কাজ করে।
- পুকুরের উপর মুরগির চাষ করা হলে মুরগির জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়।

(২) মুরগির ঘর তৈরি

- লম্বা ও শক্ত খুঁটি দিয়ে মুরগির ঘর পুকুরের গভীর পানিযুক্ত নিরিবিলি জায়গায় তৈরি করতে হয় যাতে শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে গেলেও মুরগির বিষ্ঠা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্য পানিতে পড়তে পারে।
- মুরগির ঘরের স্থানটি আলো বাতাস পূর্ণ হতে হবে যাতে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়। ঘরটি আয়তকার হওয়া প্রয়োজন।
- লম্বালম্বি ঘরে জায়গায় সাশ্রয় হয়।
- দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য ঘর দো-চালা করাই উত্তম।
- ঘরের মেঝে থেকে ৪ ফুট উঁচুতে চালা দিতে হবে। আলো-বাতাস চলাচলের জন্য ঘরের চারিদিকে মেঝে থেকে ২ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বাঁশের শক্ত চাটাই থেকে চালা পর্যন্ত বাঁশের চটা দিয়ে ফাঁক করে ঘিরে দিতে হবে।
- মুরগির ঘরের মেঝে বাঁশের বাতা দিতে এমনভাবে ফাঁক দিয়ে তৈরি করতে হবে যাতে বাতার ফাঁকে মুরগির পা ঢুকে না যায় এবং ফাঁক দিয়ে মুরগির বিষ্ঠা পানিতে পড়তে পারে।

উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে ব্রয়লার উৎপাদনের জন্য স্টারব্র জাতে ব্রয়লার পালন উত্তম। তবে, ডিম পাড়া মুরগি পালন করা যায় তবে সে ক্ষেত্রে স্টারক্রস, ইসা ব্রাউন ও লোহম্যান জাতের লেয়ার নির্বাচন করা উত্তম।

এবার আসুন, নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করে সমন্বিত হাঁস ও মাছ চাষের মডেল প্রকল্প তৈরি করি। ধরুন, আপনি একটি পুকুরে মাছের সাথে ১০০ হাঁস চাষ করবেন।

সমন্বিত হাঁস ও মাছ চাষের মডেল প্রকল্প

১০০ (একশত) হাঁস ও মাছের যৌথ চাষ প্রকল্পের একটি রূপ দেওয়া হ'ল:

কী কী উপকরণ প্রয়োজন?

- প্রয়োজনীয় মূলধন।
- পুকুর বা উপযুক্ত জলাশয় (৫০ শতাংশ)
- একশত হাঁস
- দেড় হাজার মাছের পোনা
- হাঁসের ঘর
- খাদ্য ও পানির পাত্র
- রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা

- **খরচের খাত**

মূলধন বিনিয়োগ।

(ক) পুকুর বা জলাশয়	=	নিজস্ব
(খ) ১০০টি হাঁসের জন্য ৩০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ খরচ	=	৭,০০০.০০ টাকা
(গ) খাবারের পত্র ও ডিম পাড়ার বাক্স ক্রয় বাবদ	=	৫০০.০০ টাকা

আবর্তক খরচ।

(ক) ছ'মাস বয়সের ১০০টি হাঁসের প্রতিটি ৭০.০০ টাকা হিসেবে (১০০×৭০)	=	৭,০০০.০০ টাকা
(খ) পুকুর প্রস্তুত খরচ	=	৫০০.০০ টাকা
(গ) চার ইঞ্চি মাপের দেড় হাজার পোনা প্রতিটি ২.০০ টাকা করে (১৫০০×২)	=	৩,০০০.০০ টাকা
(ঘ) প্রতিটি হাঁসের দৈনিক ১২৫ গ্রাম হিসেবে ১ বছরে (১২৫×১০০×৩৬৫) ৪,৫৬৩ কেজি খাদ্য প্রয়োজন। প্রতি কেজি ৬.৫০ টাকা হিসেবে	=	২৯,৬৬০.০০ টাকা
(ঙ) শ্রমিক মজুরি ১ বছর	=	২৯,৬৬০.০০ টাকা
(চ) হাঁসের চিকিৎসা খরচ	=	২,০০০.০০ টাকা
মোট আবর্তক খরচ	=	৫০,১৬০.০০ টাকা
মূলধনসহ সর্বমোট খরচ	=	৫৬,৬৬০.০০ টাকা

উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে ১৫% হাঁস মৃত্যুবরণ করে। এক বছর পরে হাঁসের ডিম থেকে ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার), হাঁস বিক্রি থেকে ৬,০০০ (ছয় হাজার) এবং মাছ থেকে ৪২,০০০ (বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা আয় হবে। খরচ বাদ দেওয়ার পর খামারির ৩১,৮৪০ টাকা মুনাফা হবে। মাছের সঙ্গে সাথী হিসেবে হাঁসের চাষ করা হলে হাসের বিষ্টা মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আবার এ থেকে অতিরিক্ত আয়ও পাওয়া যায়। আমাদের গ্রামেগঞ্জের নিজস্ব মালিকানায় ছোটবড় অনেক মজা পুকুর রয়েছে। অল্প পুঁজি ব্যবহার করে পুকুরটা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আয় করা যায়। এখানে একটি কথা সত্য যে, অনেকের কাছে এ কাজটি করার জন্য পর্যাপ্ত নগদ অর্থ থাকে না। সে ক্ষেত্রে ঋণ করতে হয়। এবার আসুন, কৃষিতে ঋণ প্রাপ্তির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে নিই। সরকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য মাছ চাষ প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে। বিষয়টি নিচে আলোচনা করা হলো:

যুব কর্মসংস্থান মৎস্য ঋণ

নিচের আলোচনাটিতে যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে তা সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হয়। তবে এখানে থেকে আপনি ঋণের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

মৎস্য চাষের ঋণ প্রাপ্তির নিয়মাবলি:

মৎস্য চাষের বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। এর অন্যতম কারণ উদ্যোক্তা ও পুকুর মালিকদের হাতে নগদ অর্থ নেই। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুসরণ করে যে কৃষি ঋণের পাশাপাশি মৎস্য চাষের জন্য বিভিন্ন ঋণ প্রদান করে। আসুন, এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিই।

প্রচলিত কর্মসূচির বিবরণ

মৎস্য খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ কর্মসূচির বিবরণ প্রদান করা হলো:

(ক) পুকুর মৎস্যচাষ ঋণ কর্মসূচি

এই কর্মসূচির মাধ্যমে পুকুর সংস্কারসহ বিদ্যমান পুকুরে সহজ শর্তে মাছ চাষের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। সরকার এ কার্যক্রমটি সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যথা– সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। এই ঋণের বিবরণ নিচে প্রদান করা হলো:

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

পুকুরের মালিক, ইজারাদার, যৌথ মালিকানাধীন পুকুরের অংশীদারগণ হতে আমমোক্তারনামা বা সম্মতিপত্রপ্রাপ্ত অংশীদারগণ এ ধরনের জন্য আবেদন করতে পারে। সুতরাং আপনি যদি পুকুরের মালিক হোন সহজেই এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। নিজের পুকুর না থাকলেও অন্যের মজা পুকুর ইজারা নিয়েও এ ধরনের ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

আবেদনপত্র দাখিল

আপনি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা/স্থানীয় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস থেকে ঋণের আবেদনপত্র বিনামূল্যে নিতে পারেন। আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণের পর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবেদনপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুকুরের কারিগরি সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। সরেজমিনে পুকুর তদন্ত শেষে কারিগরি সমীক্ষা সন্তোষজনক হলে এবং মালিকানা ঠিক থাকলে তিনি আবেদনপত্রে সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় পাঠাবেন। আমাদের দেশের কৃষি কর্মকর্তারা উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে নিজস্ব উদ্যোগেও মজা পুকুরের সন্ধান করে মালিককে ঋণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।

ঋণ মঞ্জুর ও জামানত

ব্যাংক কর্মকর্তা প্রাপ্ত আবেদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করেন। প্রয়োজনে একক বা যৌথভাবে পুকুর পরিদর্শন করবেন। সোনালী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী এ ঋণের ক্ষেত্রে ৫০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত কোন সহায়ক জামানত প্রয়োজন হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে, ৫০,০০০.০০ টাকার উর্ধ্বে ঋণের জন্য পুকুর জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত ঋণের টাকা মাছ চাষের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করতে হবে। অন্য কোনো কাজে এই ঋণ খরচ করা যাবে না।

সুদের হার

এই ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বর্তমান নিয়মানুযায়ী স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। খেলাপী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখের পরের দিন থেকে ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করবে। এ বিষয়গুলো অবশ্যই ঋণ চুক্তির মধ্যে বিস্তারিত বলে দেওয়া হয়।

ঋণ পরিশোধের মেয়াদ

ঋণ গ্রহীতাকে ১৮ মাস পর ঋণ পরিশোধ শুরু হবে এবং গ্রহীতা ৪টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে সম্পূর্ণ ঋণ সুদসহ পরিশোধ করতে হবে।

কৃষিঋণের বাইরেও আরো ঋণ কর্মসূচি আছে। এদের মধ্যে পল্লীঋণ খুব জনপ্রিয়। আসুন, এ ঋণের আদ্যোপান্ত জেনে নিই।

(খ) সাধারণ ঋণ কর্মসূচির আওতায় পল্লী ঋণ

এই কর্মসূচির আওতায় শিক্ষিত বেকার যুবক/যুব মহিলাদের ঋণ দেয়া হয়। এই ঋণ প্রদানের সাধারণ নিয়মগুলো নিচে প্রদান করা হলো:

ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা ও মেয়াদ

শিক্ষিত বেকার যুবক/যুব মহিলা মৎস্য চাষের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য। তবে মৎস্য চাষের উপর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। ঋণ গ্রহণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের গ্রুপ গঠনের প্রয়োজন হবে। যে সমস্ত পুকুরে মাছ চাষ হচ্ছে না তা গ্রুপের নামে লীজ গ্রহণ করতে হবে।

এই ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হলো পাঁচ বছর।

ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি

এই ঋণ পরিশোধ অনেকটা মজার যেমন– প্রতিবার মাছ ধরার সময় বিক্রিত মাছের মূল্যের ৫০% ঋণের হিসাবে জমা হতে যতদিন না সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয়। বাকী ৫০% টাকা গ্রুপ সদস্যরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পুকুরের মাছ ধরা এবং বিক্রি হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ কর্মসূচির প্রচলিত নীতিমালা প্রায় একই ধরনের। তবে ব্যাংকভেদে বিদ্যমান ঋণসীমা ভিন্নতর। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ কর্মসূচির খাতসমূহ ও ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নিচে প্রদত্ত হলো:

<table>
<tr><th>ব্যাংক</th><th>খাত</th><th>ঋণসীমা</th><th>সুদের হার</th></tr>
<tr><td rowspan="5">বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক</td><td>পুকুরে মৎস্য চাষ</td><td>বিঘাপ্রতি ২১,৩০০.০০ টাকা</td><td rowspan="5">৮%</td></tr>
<tr><td>উপকূলীয় এলাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ কর্মসূচি</td><td>প্রতি ১০ একর চাষের জন্য ১,৮১,০০০.০০ টাকা হতে ১,৮৬,০০০.০০ টাকা</td></tr>
<tr><td>উন্নত ব্যাপক পদ্ধতিতে গলদা চাষের ঋণদান কর্মসূচি</td><td>একর প্রতি ৬০,০০০.০০ টাকা হিসেবে জমির পরিমাণের উপর</td></tr>
<tr><td>উন্নত সনাতন পদ্ধতি</td><td>একর প্রতি ৬০,০০০.০০ টাকা হিসেবে জমির পরিমাণের উপর</td></tr>
<tr><td>পুকুরে মধ্য মেয়াদ মাছের চাষ</td><td>মূলধন ব্যয় ৩৭,০০০.০০ টাকা + বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য আলাদা নীতিমালা</td></tr>
<tr><td rowspan="4">সোনালী ব্যাংক</td><td>পুকুরে মৎস্য চাষ</td><td>একর প্রতি ৭৫,০০০.০০ টাকা</td><td rowspan="4">৮%</td></tr>
<tr><td>সনাতন পদ্ধতি উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে</td><td>একর প্রতি ২৪,৭০০.০০ টাকা একর প্রতি ১,৩১,২৯৮.০০ টাকা ১,৯৬,২০০.০০ টাকা (১০ একরের জন্য)</td></tr>
<tr><td>হ্যাচারি
১০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের জন্য ১৫০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের জন্য</td><td>৩,৪০,৫১৫.০০ টাকা
৪,৭৩,৩৮.০০ টাকা</td></tr>
<tr><td>এক একর পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের পোনা চাষ
এক ধাপ পদ্ধতি
দুই ধাপ পদ্ধতি</td><td>
৩৪,৪২৬.০০ টাকা
৭৫,৮৮০.০০ টাকা</td></tr>
<tr><td>অগ্রণী ব্যাংক</td><td>পুকুরে মাছ চাষ (সর্বোচ্চ এক একর)
পুকুর পুনঃখনন
পানি নিষ্কাশন ও উপকরণ বাবদ</td><td>বিঘা প্রতি ১৫,০০০.০০ টাকা
বিঘা প্রতি ২,২০০.০০ টাকা
মোট= ১৭,২০০.০০ টাকা</td><td>৯-১০%</td></tr>
<tr><td>জনতা ব্যাংক</td><td>পুকুরে মাছ চাষ
পুকুর সংস্কার
পুকুর প্রস্তুতি
পোনা ক্রয়, উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয়</td><td>একর প্রতি ১০,০০০.০০ টাকা
একর প্রতি ১০,০০০.০০ টাকা
একর প্রতি ১০,০০০.০০
মোট= ৫০,০০০.০০ টাকা</td><td>৯-১০%</td></tr>
</table>

ব্যাংক ছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমেও মৎস্য চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যায়। আসুন, সে সম্পর্কে জেনে নিই–

(গ) মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৎস্য ঋণ কর্মসূচি

১ সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

দরিদ্র চাষি, মৎসজীবী, বেকার যুবক ও মহিলাদের সম্পৃক্ত করে সমন্বিত মৎস্য চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য এই কর্মসূচি থেকে মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান করা হয়।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

গ্রামীণ দরিদ্র চাষী, মৎস্যজীবী, শিক্ষিত বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা, প্রান্তিক চাষী যাদের বাড়ির ভিটা ছাড়া সর্বোচ্চ ১ বিঘা জমি আছে এবং নিজস্ব অথবা ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে পুকুরের মালিক এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য।

ঋণের জামানত

এ ঋণের জন্য কোন জামানত দিতে হয় না। তবে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে ১৫০.০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর একটি চুক্তিনামা করতে হবে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আপনার চাষের পুকুর এবং সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে চুক্তিনামা সই করবেন।

ঋণের পরিমাণ

জলাশয়ের আয়তনের উপর নির্ভর করে একর প্রতি ৪০,০০০.০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়।

ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি

ঋণের আসল পাঁচ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। ১ম বছর ঋণের আসল কর্তনের ১৫% পরবর্তী ৪ বছর যথাক্রমে আসলের ২৫%, ২৫%, ২৫% ও ১০% হারে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

সার্ভিস চার্জ

ঋণের আসল টাকার উপর ৫% হারে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হবে। এর মূল কারণ হলো এই ঋণ কার্যকর করার জন্য পর্যাপ্ত তদারকি করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ঋন ও ক্ষুদ্র ঋনের উৎস গুলো বর্ণনা করবেন।

সারাংশ

সরকার কর্তৃক বরাদ্দ ৬০ শতাংশের বেশি বিতরণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি আছে। মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ঋণ দিয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গ্রামীণ ব্যাংক কতসালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৯০ খ. ১৯৯৩

গ. ২০০০ ঘ. ১৯৯৮

পাঠ-৮.৫ কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি সামগ্রী বিপণন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- কৃষি বাজারজাতকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কৃষিসামগ্রী বিপণন

কৃষিসামগ্রী বিপণন (Agricultural Marketing) ইতিহাস কৃষির ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। কৃষিভিত্তিক সমাজে পণ্য বিনিময় প্রথার প্রাধান্য ছিল। তবে মুদ্রা প্রচলনের পরে কৃষিদ্রব্য বিপণন সহজতর এবং বিনিময় সমস্যা দূর হয়েছে। বিভিন্ন শস্যের বাজারমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধিতে কৃষকরা অত্যন্ত সংবেদী বিধায় কোনো এলাকার শস্যচাষের ধরন শস্যগুলির ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক ফসল চাষে কৃষকের আগ্রহও কম থাকে। তুলনামূলক লাভক্ষতির বিবেচনা সাপেক্ষে স্মরণাতীতকাল থেকে কৃষকেরা শস্য নির্বাচনে অগ্রাধিকার পরিবর্তন করে আসছে। তাই কৃষি বিপণন খুব জরুরী।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত থাকায় তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই ফসল উৎপাদন করে। এ দেশে ধান, পাট, তুলা, ইক্ষু ও চায়ের মতো প্রধান পণ্য বিপণন পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও পর্যাপ্ত নয়। খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, চিনিকল ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড নিজ নিজ ক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে। কিন্তু অধিকাংশ কৃষিদ্রব্য বিভিন্ন ধরনের মধ্যগদের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌঁছে। সরকারি সংস্থা হিসেবে কৃষি বাজারজাতকরণ অধিদপ্তর বস্তুত: উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে ঘোষিত কৃষিনীতিতে কৃষিদ্রব্য বাজারজাতকরণ উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খামারজাত দ্রব্যাদি যথাসময়ে বিক্রির জন্য সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষিপণ্যের ওপর দালাল-ফড়িয়াদের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের জন্য ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণেও এ নীতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ রয়েছে। স্বাধীনতার পর কৃষিদ্রব্য ও কৃষি উপকরণ বিপণনে এসব নীতি বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়। সরকার বিগত তিন দশকে নিয়ন্ত্রণ গুটিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে এবং কৃষি উপকরণ ও খাদ্যশস্যের সংগ্রহ ও বিতরণে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকার শস্য চাল, ডাল, গম, তেলবীজসহ নানা ধরনের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন শাকসবজি, ফল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি কৃষিপণ্য এ দেশের কৃষক ও খামারিরা উৎপাদন করে। বিশেষত আমাদের দেশে প্রতি বছরই বিভিন্ন মৌসুমি শাকসবজির ক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদন মৌসুমে পণ্যের দাম কম থাকে এবং পরবর্তী সময়ে সেসব কৃষিপণ্য শহরাঞ্চলে চড়া দামে বিক্রি হয়। গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কৃষকরা বেশি দিন মজুদ করে রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে কৃষকরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। নিচু এলাকা ও চরাঞ্চলের হাজার হাজার একর জমিতে প্রতি বছর উৎপাদিত শত শত কোটি টাকার মৌসুমি ফল ও শাকসবজি নষ্ট হয়। প্রতি বছর শত শত কোটি কোটি টাকার আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজসহ নানা জাতের মৌসুমি জাতের ফল প্রচুর উৎপন্ন হয়। কিন্তু অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য যথাসময়ে বাজারজাত করতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির ভারে দিন দিন কৃষির ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

আমাদের দেশে এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী অনেকটাই সুসংগঠিত। তাদের গুরুত্বও কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তাই কৃষক ও উৎপাদক শ্রেণী সর্বদাই তাদের পণ্য বাজারজাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাজার ব্যবস্থা পরিচালনা করা অসম্ভব, যদি না তাদের বিকল্প কোনো মাধ্যম বা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

মধ্যস্বত্বভোগীদের উপস্থিতি কমাতে হলে উৎপাদক ও ভোক্তা শ্রেণীর মাঝে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উভয় পক্ষই লাভবান হতে পারে। এজন্য গ্রামীণ উৎপাদক শ্রেণীর কাছ থেকে পণ্য ও সেবা সরাসরি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা গেলে সমস্যার সমাধান হতে পারে, এমন ধারণাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এ ধারণাকে কেন্দ্র করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক 'নর্থ ওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট' ও 'সাউথ ওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্টের' মাধ্যমে কৃষকের মাঠ থেকে সরাসরি পণ্য রাজধানী ও রাজধানীর খুচরা বাজারে বিক্রির প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল।

কৃষি বিপণন পদ্ধতি খামার পণ্য এবং খাদ্য ও কৃষি পণ্যের ভোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যেহেতু কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করা প্রয়োজন, তাই বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা আনয়নের জন্য একটি শক্তিশালী বাজার অবকাঠামো তৈরী করা আবশ্যক। তাই সরকার তার কৃষি নীতিতে এ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছে। তাহলে আসুন, কৃষি নীতিতে বিপণনের বিষয়ে কি বলেছে সে সম্পর্কে জেনে নিই–

১। বিপণন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়নঃ

- সরকার গ্রাম্য-বাজার স্থাপন ও পাইকারী বাজারে কৃষি পণ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন হতে ভোক্তাপর্যায়ে কৃষি পণ্যের নির্ঝঞ্ঝাট সরবরাহে সহায়তা করবে ;
- উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে কার্যকর মূল্য শৃংখল (Value Chain) তৈরীর প্রচেষ্টা নেয়া হবে ;
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের কৃষি পণ্যের বাজার উন্নয়ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে ;
- কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ এবং পূনর্গঠন করা হবে ;
- কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ এবং গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মাফিক গুদাম এবং হিমাগার সুবিধাদি স্থাপনে সরকারী উদ্যোগসহ বেসরকারি বিনিয়োগকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে; এবং
- কৃষি পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষা ও প্রমানিতকরনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ল্যাবরেটরি ও পরীক্ষা কেন্দ্রস্থাপনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

২। বাজার তথ্য ও সম্প্রসারণ সেবাঃ

- কৃষক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের কৃষিপণ্য এবং কৃষি উপকরণ সমূহের বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহও প্রচারকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে ;
- সরকার কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সংযোজনে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান কার্যক্রম প্রবর্ধন করবে ;
- সঠিক মূল্য ও মানসম্পন্ন কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ সমূহকে উৎসাহিত করা হবে ;
- উৎপাদন এবং উৎপাদন পরবর্তী সময়ে নিরাপদ খাদ্যের বিষয় সরকার উৎসাহিত করবে; এবং কৃষি পণ্যের প্যাকেজিং, গ্রেডিং ও লেবেলিংয়ের কার্যক্রম উৎসাহিত করা হবে।

৩। এগ্রোপ্রোসেসিংঃ

- সরকার কৃষি পণ্য ভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করবে;
- কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন চেইন (ভ্যেলু চেইন) উন্নয়নে কাজ করা হবে; এবং
- সরকার কৃষি পণ্য ভিত্তিক শিল্পে বিশেষ প্রনোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪। রপ্তানী ও বাজার উন্নয়নঃ

- সরকার বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠী এবং মূলধারার বাজারে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীকে উৎসাহিত করবে ;
- সরকার কৃষি পণ্য বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং বর্হিবিশ্বে নতুন ও সম্ভাবনাময় বাজারের সন্ধান করবে;
- পরিবেশ বান্ধব কৃষি/জৈব কৃষিজাত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; এবং
- রপ্তানী বাজার উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং তথ্য আহরণ ও বিতরণে ই-অবকাঠামোর বিকাশ উৎসাহিত করা হবে।

৫। বাজার বিধিমালা ও সহায়তাকরণ:

- বাজার কর্মকান্ড পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাজার সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা শক্তিশালী এবং হালনাগাদ করা হবে ;
- কার্যকর বাজার পরিচালনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং সমন্বয়কে সরকার উৎসাহিত করবে ; এবং খাদ্যে স্বয়ংম্ভর জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ়করণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিয়তায় কৃষকদের ন্যায্যমূল্য
- প্রাপ্তি ও ভোক্তাদের সামর্থের মধ্যে কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য নির্দেশনা
- প্রদান করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি মূল্য কমিশন গঠন করবে।

৬। বেসরকারী খাতে কৃষি-বাণিজ্য সম্ভাবনা:

- সরকার ব্যক্তি উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের কৃষি-বাণিজ্য কার্যক্রম গ্রহণে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে ; এবং
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃষি পণ্য বাজার পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিবে।

সারাংশ

কৃষি বিণন জরুরী। সরকারী সংস্থা হিসেবে কৃষি বাজারজাতকরণ অধিদপ্তর বস্তু উৎপাদক এবং ভোক্তা উভয়ের জন্য কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দায়িত্ব। কৃষি বিপণন পদ্ধতি খামার পণ্য এবং খাদ্য ও কৃষি পণ্যের ভোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১।

ক. খ.

গ. ঘ.

২।

ক. খ.

গ. ঘ.

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। ২। ৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। ২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। ২। ৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ ঃ ১। ২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ ঃ ১। ২। ৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ ঃ ১। ২। ৩।